# উনিশ শতকে ভারত উপমহাদেশে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সানজিদা মুস্তাফিজ *

**সার-সংক্ষেপ ঃ** ভারত উপমহাদেশে শাসনের ভিত শক্ত করে উনিশ শতকে ইংরেজ সরকার কিছু জনহিতকর আইন প্রণয়নের চিন্তাভাবনা শুরু করে। উনিশ শতকে ভারতীয় সমাজে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কারমূলক আইন প্রণীত হয়েছিল। উনিশ শতকে বাল্য ও বহু বিবাহের মত সামাজিক অসঙ্গতিমূলক বিষয়গুলো বন্ধ করার জন্যও সংস্কারবাদীরা চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো কিভাবে সংস্কারবাদীরা উনিশ শতকে বাল্য ও বহু বিবাহের মত বিষয়গুলো সমাজের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে মূল্যায়ন করে সেসব বন্ধ করতে বিভিন্ন সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল, তা তুলে ধরা। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে ভারতীয় সমাজ সংস্কারের সবকিছুর উর্ধ্বে ছিল মানবতাবাদ এবং প্রচলিত অসঙ্গতিমূলক বিষয়গুলো সমাজ হতে দূর করতে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রচেষ্টার ভূমিকা ছিল অসীম। সামাজিক সংস্কারে আইনের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং তা প্রচলিত বিষয়ের সাথে মিল রেখে সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ রাখে।

**সূচক শব্দ ঃ** বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, সমাজ সংস্কার, আইন প্রণয়ন, আইনের সংস্কার।

## ভূমিকা

ভারতীয় সমাজে প্রথা মানেই হলো দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কিছু বদ্ধমূল ধারণা যা পালন করার ক্ষেত্রে এক ধরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসকল প্রথা সমাজে কল্যানের জন্য পালন করা হয় বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সমাজের অবনতির ক্ষেত্র তৈরি করে। তখন সেসব প্রথা উচ্ছেদ বা সংস্কারের জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন। দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ প্রথা। ভারতে উনিশ শতকে যখন সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতির ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠছিল তখন বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের প্রতিও সংস্কারবাদীরা দৃষ্টি দিয়েছিল। যদিও এ দু'টি প্রথা সতীদাহ প্রথার মত নির্মম ছিল না বা বিধবা বিবাহের মত স্বীকৃতিমূলক আন্দোলনও ছিল না। যে কারণে এ বিষয়গুলোতে আইন প্রণয়নে ইংরেজ সরকার ততটা গুরুত্ব দেয়নি। তাছাড়া এ সংক্রান্ত আইন প্রণীত হলে সমাজের অনেক গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত মানুষের স্বার্থে আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল। যার ফলে ইংরেজ সরকারের সাথে অভিজাত পরিবারগুলোর পারস্পরিক সমঝোতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারত। তবে ক্রমান্বয়ে বহু

* সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

বিবাহ ও বাল্য বিবাহ সামাজিক ব্যাধির মত সমাজে ছড়িয়ে পড়া ও এ সংক্রান্ত সৃষ্ট অনাচারের উপর ভিত্তি করে সংস্কারবাদীরা এ প্রথা সমূহ রদ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। ভারতে শাসনের ভিত মজবুত হওয়ার পর উনিশ শতকে ইংরেজ সরকার কিছু জনহিতকর আইন প্রণয়নের চিন্তাভাবনা শুরু করে। ভারতীয় সমাজে যে সকল কল্যাণকর আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তার মধ্যে 'সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন'- ১৮২৯, 'হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন'- ১৮৫৬ উল্লেখযোগ্য (ইসলাম, ২০০৩: বিবাহ)। মূলত এ জনহিতকর সংস্কারমূলক আইনী কার্যক্রম গৃহীত হওয়ার পর সংস্কারবাদীরা বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের কারনে সৃষ্ট সামাজিক অসঙ্গতি সমূহ তুলে ধরে এগুলো রদের জন্য আইন প্রণয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। ইঙ্গ-ভারতীয় কিছু সংবাদপত্র, কিছু সংগঠন ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহ বেশ কয়েকজন দেশীয় সংস্কারবাদী ব্যক্তি এ সামাজিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু উদারনৈতিক শাসকের মানবিক চেতনাবোধ জাগ্রত করে আইন প্রণয়ন করা। এসব সামাজিক সংস্কার মূলক আন্দোলন ও শাসক গোষ্ঠীর উদার চেতনাবোধই সমাজের ভিত্তিহীন প্রথাগুলোর মূলোৎপাটনে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখে।

**গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

একটি আইন কিভাবে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে, কিভাবে আইন দ্বারা সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কার সাধিত হয় এবং সামাজিক কোন কোন প্রেক্ষাপটে আইনের পরিবর্তন ঘটে তাই মূলত আইনের ইতিহাসে আলোচিত হয়। বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদের বিষয়টি সমাজের জন্য কল্যানকর হিসেবে গণ্য হয়ে আইনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে কিভাবে মূল্যায়িত হতে পারে তা উক্ত প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ ছিল আচারনিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে বদ্ধমূল ধর্মীয় প্রথা। শিক্ষিত অনেক হিন্দুমতাবলম্বীও তখন এ প্রথার পক্ষে ছিল এবং তারা তা পালন করতো। সেক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো শাস্ত্রসম্মত ও সামাজিক ভাবে কল্যাণকর না, শুধুমাত্র এটুকু প্রমান করলেই সমাজ তা মেনে নেবেনা। এমন ধারণা থেকেই বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় কিভাবে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের মত বিষয়গুলো ভিত্তিহীন হিসেবে মূল্যায়িত হলো এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসব প্রথা রদের জন্য আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলোর সামগ্রীক লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের যে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে তা তুলে ধরাই মূলত এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

উনিশ শতকের শুরু থেকে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন ভাবে প্রচার প্রচারণা শুরু করে। এসব প্রচার প্রচারণা চলছিল ব্যক্তিগত ও

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে। তৎকালীন ভারতীয় পত্র-পত্রিকা সমূহ এ সংক্রান্ত অসংখ্য লেখা প্রকাশ করে যার মাধ্যমে এ বিষয়গুলোর গভীরতা ও বহুমাত্রিকতার দিকগুলো ফুটে ওঠে। যা ছিল বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রদ করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের পক্ষে একটি ইতিবাচক দিক। পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন লেখনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তির বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ। বর্তমান গবেষণায় এসকল পত্রপত্রিকা, প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর আওতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজে প্রচলিত দীর্ঘমেয়াদী প্রথা সম্পর্কে জনমনে বদ্ধমূল কিছু ধারণা জন্মে। শিক্ষা বা প্রগতিশীল চিন্তাধারাও অনেক ক্ষেত্রে সেসকল বদ্ধমূল প্রথা অপসারণে অপরাগতা প্রকাশ করে। একদিকে গোড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীলপন্থী অন্যদিকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কারপন্থীদের মধ্যে বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ নিয়ে বিভেদ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। সমাজে এ দু'পক্ষের কর্মকান্ডের ভূমিকায় গতিময়তা ও টানাপোড়েনের সংঘাত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত অনেক হিন্দুও ছিলেন বাল্য ও বহু বিবাহের পক্ষে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকার দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয়দের প্রচলিত প্রথায় হস্তক্ষেপ করার বিপক্ষে ছিল। ফলে বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ রদে আইন প্রণয়নে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভূমিকা নির্ধারণে এক ধরনের দ্বান্দ্বিকতা তৈরি হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হবে। রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী বিভিন্ন সংগঠন, পত্রপত্রিকা, ব্যক্তিবর্গ, ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ রদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে বিভিন্ন যুক্তি, মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, সমর্থিত কিংবা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। যা ছিল সমাজে বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে নানামুখী দ্বন্দ্বের উদাহরণ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিজেদের স্বার্থে এ বিষয়ের পক্ষে ছিল বা বিরোধিতা করেছিল। সামাজিক ভাবে ক্ষতিকর এ বিষয়গুলো আইন করে উচ্ছেদের লক্ষ্যে কি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার ভূমিকা কি ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করার প্রয়াস উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে।

**গবেষণা পদ্ধতি**

উনিশ শতকে সমাজসংস্কারমূলক বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক ও গৌণ গবেষণা হয়েছে। তবে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন গবেষণা হয়নি। বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা বিষয়ক পর্যালোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৌণ তথ্য-উপাত্তের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে উনিশ শতকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্র অর্থাৎ তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও নিবন্ধ, উনিশ শতকের সমাজসংস্কারকদের জীবনী এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে উক্ত গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা উক্ত প্রবন্ধে উপস্থাপনের পূর্বে যাচাই করা হয়েছে। গৌণ উৎস ব্যবহারের

ক্ষেত্রে যেহেতু কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বলে এ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যগুলোকে বিভিন্ন তথ্যের সাথে যাচাই করে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে প্রবন্ধটিকে তথ্যের অনুমান নির্ভরতা, অপ্রতুল তথ্যসূত্র ব্যবহার করা এবং অপর্যাপ্ত বর্ণনার মত বিষয় হতে মুক্ত রাখা হয়েছে।

## বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের উদ্ভব এবং বিকাশ

ভারতীয় সমাজে ব্যাধিরূপে প্রথা হিসেবে প্রচলিত বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের পেছনে হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র গ্রন্থের প্রভাব ছিল। প্রাচীন জীমূতবাহনের ব্যাখ্যা, কিছু শিলালিপিতে বহুবিবাহের প্রমান পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মীয় বিধানে ব্রাহ্মণ ৪টি, ক্ষত্রিয় ৩টি, বৈশ্য ২টি বিয়ে করতে পারবে বলে বলা হয়েছে। কৌটিল্যও তারে লেখায় উল্লেখ করেছেন বহু বিবাহ সম্পর্কে। তার মতে, পুত্র প্রজনন না হলে পুনরায় স্বামীর বিয়ে করা শাস্ত্রসম্মত। বাল্য বিয়ে নিয়ে শাস্ত্রীয় আইন প্রণেতা মনুর ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। মনু সংহিতায় বিয়ের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, পুরুষের বয়স ৩০ হলে নারীর ১২, পুরুষের ২৪ হলে নারীর হবে ৮, এভাবে সংখ্যানুপাত দেখানো হয়েছে। বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহের মত সামাজিক ব্যাধিগুলোর মূল কারণ ছিল কৌলিন্য প্রথা। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সমাজে কুলিন ব্রাহ্মণগণ বিবাহ ব্যবসায়ীর ভূমিকা পালন করত। কৌলিণ্য প্রথার আবির্ভাব পনেরো শতকের পূর্বে যা উনিশ শতকেও অব্যাহত থাকে। রাজা আদিশূর বাংলার শৃঙ্খলাহীন ব্রাহ্মণদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। এদের ছাপ্পান্ন সন্তান ছাপ্পান্ন গাইয়া ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। বাংলার পূর্বের ব্রাহ্মণগণ পরিচিত হন সাতাশ ঘর হিসেবে যাদের সপ্তসতী বলা হতো। সেন বংশীয় শাসক বল্লাল সেন আনুমানিক ১১৫৮ সালে কৌলিন্য প্রথার সূচনা করেন। কান্যকুব্জ থেকে আগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে যখন বিভিন্ন অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন সাধারণ প্রজারা সম্মান লাভের জন্য সৎ পথে চলবে এ ধরনের চিন্তা থেকে তিনি কুলিন প্রথার উদ্ভব ঘটান। প্রজাদের মধ্যে ভাল আচার ব্যবহার সম্পন্ন, ধার্মিকতা সংশ্লিষ্ট নয়টি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে কুলিন উপাধি দেয়া হতো (সান্যাল, ১৯১০: ২৬)। ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে মর্যাদার দিক দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল, যথাঃ গৌণ কুলিন, শ্রোত্রিয় ও কুলিন। তখন থেকে সৎকুলে কন্যাদান ও সৎকুলজাত কন্যাগ্রহণ কুল কৌলিন্য বলে বিবেচিত হত। বলাল্লী প্রথায় 'সর্বদ্বারী বিবাহ' প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে লক্ষ্মণ সেনের সময়কালে কৌলিন্য প্রথাকে বংশানুক্রমিক করা হয় এবং বিবাহ প্রথার মাধ্যমে কুলিনদের মর্যাদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে বলে নির্ধারিত হয়। এসময় দেবীবর নামক ব্যক্তি 'মেল বন্ধন' পদ্ধতিতে বিবাহ রীতি চালু করে। এ পদ্ধতিতে বিবাহের পরিসর ছোট করে দেয়। ব্রাহ্মণদের সম্মান সাময়িক ভাবে অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে যে অগোছালো, ক্ষতিকর প্রথার জন্ম দিল তা হলো বহু বিবাহ। তখন থেকে শ্রোত্রিয় হিসেবে চিহ্নিত শ্রেণীটি কুলিন শ্রেণীর সাথে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের কন্যার বৈবাহিক সম্পর্ক করে মান-সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা শুরু করে। এ সময় মূলত কুলিনরা অর্থ লাভের আশায় বহু বিবাহে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

পরবর্তীতে কুলিনদের বিভিন্ন দোষ বিচার করে মোট ছত্রিশটি সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয়। যা মেলবন্ধন প্রথার অংশ। এ মেলবন্ধন প্রচলিত হওয়ার আগে কুলিনরা নিজেদের মধ্যে বিয়ে করত যা 'সর্বদ্বারী বিবাহ' নামে পরিচিত। কালের পরিবর্তে অল্পকিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলবন্ধন নির্দিষ্ট করে দেয়ার পর কুলিনদের মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যায় (বসু, ১৯১৩: ২৬)। সেসাথে সামাজিক অনাচারেরও উদ্ভব হয়। একদিকে কম বয়সী মেয়েদের সাথে বৃদ্ধ কুলিনের বিয়ে অন্য দিকে বৃদ্ধার সাথে কম বয়সী ছেলেদের বিয়ে হতে থাকে। কয়েক মাস বয়সী থেকে সত্তর বছর বয়সী মেয়েকে কখনও এক পাত্রের সাথে বিয়ে দেয়া হতো, আবার ছয়-সাত বছর বয়সী পাত্রের সাথে ত্রিশ থেকে ষাট বছর বয়সের আট-দশ জন পাত্রীর বিয়ে হতো। একই দিনে কোন কুলিন ব্যক্তির চার-পাঁচটি করে বিয়ের খবরও পাওয়া যায়। কখনও কুলিন পাত্রের অভাবে একই ঘরের গৃহকর্তা তার সব বোন ও মেয়েদের একই কুলিন পাত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছিল বলেও খবর পাওয়া যায়। অনেক মেয়ে জীবনে শুধু মাত্র বিয়ের রাতেই স্বামীর দেখা পেত আর কখনও শেষ দেখা হত স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণের সময়। অনেক কুলিন বিয়ের রাতে বা পর দিন ভোরে বার্ধক্য জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করত এমন উদাহরণও অসংখ্য পাওয়া যায় (*The Calcutta Christian Observer*, 1836: 58-9)। উনিশ শতকেও শত বিবাহকারী কুলিনের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায় । রামমোহন রায় ১৮১৯ সালে কুলিন মেয়েদের নিয়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানেও তিনি দেখিয়েছেন, কুলীন ব্রাহ্মণরা দশ-পনেরটি বিয়ে করছে শুধুমাত্র অর্থ প্রাপ্তির আশায়। বিয়ের পর অধিকাংশের সাথে আর স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয় না। যদি শ্বশুর বাড়ি আসলে হাতে মোটা অংকের অর্থ দেয়া হতো তবেই পুনরায় তাদের আগমন ঘটত। সেসকল স্ত্রীগণ ধর্মের ভয়ে স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ ছাড়া অথবা স্বামীর কাছ থেকে কোন উপকার না পেয়েই পিতা বা ভাইয়ের ঘরে নানান দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অবস্থান করত (ঘোষ, ১৯৯৮: ২০২)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুলিনদের স্ত্রীগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হত ও বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করত। ১৮৫৩ সালের কলকাতা চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের দেয়া এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী কলকাতার তৎকালীন ১২,৪১৯ জন যৌনকর্মীর মধ্যে কুলিন ব্রাহ্মণ মেয়েদের সংখ্যা ছিল বেশি (*'The Calcutta Review'*, Vol.XLVII, 1868: 142)। কুলিন ব্রাহ্মণের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা এ রীতিতে অনেক অকুলিন ব্রাহ্মণ আবার বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজে পেত না। তখন তাদেরকে মেয়েদের পিতাকে অর্থ দিয়ে বিয়ে করতে হত। যে কারণে সমাজে বিয়ের জন্য কন্যা বিক্রি করা একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে দেখা দেয়। অকুলিনরা যে কারণে কৌলিন্যপ্রথা উচ্ছেদে সোচ্চার ছিলেন। তারা ১৮১৫ সালে কুলিন প্রথা উচ্ছেদে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে আবেদন করারও পরিকল্পনা করেছিলেন (*The Asiatic Journal and Monthly Register*, Vol. 5, 1831: 115)। কুলিনদের এ বহুবিবাহের প্রভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর মূলত দাসীবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি, সতী হওয়া অথবা অল্প বয়সে বিধবা হিসেবে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টে জীবন-যাপন করা

ছাড়া কুলিন স্ত্রীদের আর কোন পথ থাকে না। সেসাথে বহুবিবাহের কুফল হিসেবে এসময় প্রচুর আত্মহত্যার ঘটনারও তথ্য পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে বহুবিবাহ, বিধবা সমস্যা, বাল্য বিবাহ সব সমস্যার মূল কারণ ছিল কৌলিন্য প্রথা।

অন্যদিকে সমাজের ক্ষতিকর সমস্যা রূপে চিহ্নিত বাল্য বিবাহের উৎপত্তি মূলত হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রগুলোকে কেন্দ্র করে। স্মরণীয় স্মৃতিতে বাল্য বিবাহের স্বপক্ষের বিভিন্ন যুক্তি উল্লিখিত আছে। স্মৃতিকারগণ বিবাহযোগ্য কন্যাদের চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমনঃ আট বছরে গৌরী দান, নয় বছর বয়সে কন্যাদান বা রোহিনী দান, দশ বছরে কন্যা এবং এর ঊর্ধ্বে রজস্বলা। এছাড়াও কোন কোন স্মৃতিকার নগ্নিকা দান, অন্যপূর্বা কন্যার কথাও উল্লেখ করেছেন। যেখানে কুলির ঘরে কন্যা জন্মালে দু-এক মাসের মধ্যে সমবয়সী কোন কুলিন ছেলের সাথে বিবাহ স্থির করা হত। এরপর আট দশ বছর বয়সে বিয়ে করানো হত। যদি বিবাহের আগে বাগদত্তার মৃত্যু হয় তবে সে মেয়ে অন্যপূর্বা নামে পরিচিত হত (শাস্ত্রী, ১৯৫০: ১৫)। বৈদিক শ্রেণীর বিয়ের এ স্মৃতি নির্দেশিত বিধান ক্রমান্বয়ে দেশাচারে পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকে প্রাচীন ভারতীয় স্মৃতি শাস্ত্রের শীথিলতা, ইসলামী শাসনে নিরাপত্তাহীনতা এবং কৌলিন্য ও পণ প্রথার প্রভাবে বাল্য বিবাহ সমাজে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। যার ফলে এর বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে আন্দোলন গড়ে ওঠে। রক্ষণশীলদের একাংশ বাল্য বিবাহকে বজায় রাখতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তবে সমাজের সর্বত্র এ প্রথার কুপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ পুরুষকে বাল্য বিবাহের শিকার হয়ে অল্প বয়সে ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটিয়ে উপার্জনহীনভাবে থাকতে হত। একই ভাবে আত্মীয়দের ভরণ-পোষণের চাপে নিজস্ব স্বাধীনতার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদেরকে প্রতি ক্ষেত্রে অপমানিত ও দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হত।

## বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টায় সংস্কারবাদীদের ভূমিকা

সামাজিক সংস্কারের অংশ হিসেবে বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ রদের জন্য উনিশ শতকে কিছু মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। সতের শতকে সম্রাট আকবর বহুবিবাহ প্রথা দূর করতে চেয়েছিলেন। সনাতন শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে সংস্কারপন্থীরা বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদ করতে আগ্রহী ছিলেন। বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এসব বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। ঋকবেদে বলা আছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উচিত পুনরায় বিবাহের বিষয়ে সংযমী হওয়া (১০.৮৫.২৩), অথর্ববেদে বলা হয়েছে, স্বামীর উচিত শুধু একমাত্র স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকা (৭.৩৮.৪)। সেসাথে আরও বলা হয়েছে একজন নারীর কখনও যেন সতীন না হয় (৩.১৮.২)। রামমোহন রায়, পরবর্তীতে তার ছেলে রমাপ্রসাদ রায়, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রদে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ, ইয়ং বেঙ্গলের মত সভা-সংগঠনও কাজ করেছিল বহু বিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে। কিছু বিশেষ অবস্থা ছাড়া রামমোহন দ্বিতীয় বিয়ের সমর্থক ছিলেন না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হলে সেক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর শাস্ত্রে উল্লেখিত

কোন সমস্যা থাকলে তা সরকারি কর্মকর্তাকে জানিয়ে তার অনুমতি নেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি ধারণা করতেন এতে করে মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে। এ ছাড়া তিনি নিজের ছেলে বা কোন আত্মীয় বহুবিবাহ করলে তার করা উইলে তাদের সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করার শর্ত দিয়েছিলেন (Mukherjee, 1968: 287)। রামমোহনের পর বহু বিবাহের বিরুদ্ধে ছিল ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা। তাদের বিভিন্ন সভা সমিতি ও পত্র পত্রিকাগুলোতে বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ নিয়ে নানান ধরনের আলোচনা দেখা যায়। খ্রিস্টান মিশনারিরাও বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রোধে সচেষ্ট ছিল। ১৮০৫ সালে ক্লডিয়াস বুকানন তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণের অন্যতম কারণ হল কৌলিন্য প্রথা। শুধুমাত্র যৌতুকের লোভে কুলিনরা বিয়ে করে এবং বিয়ের পর স্ত্রীরা স্বামীর দেখা না পেয়ে এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় মেয়েরা খারাপ পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। কুলিনদের স্ত্রীগণ পিতার বাড়িতে অবস্থান করত। বছরে বা কয়েক বছরে একবার কুলিন স্বামীর দেখা পেত স্ত্রীরা। কুলিনদেরকে শ্বশুরবাড়িতে প্রণামী বা অর্থ দিয়ে আপ্যায়িত করা হত। তাদের এক এক জন কুলিনের এত সংখ্যক স্ত্রী থাকত যে স্ত্রীদের নাম ঠিকানা স্মরণ রাখতে তারা খাতা ব্যবহার করত। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণরাও এ প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিল। সেসাথে তিনি বেশ কিছু কুলিনের বিয়ের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন যেখানে কলকাতা, বিক্রমপুর, বর্ধমান, যশোর, শান্তিপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলের কুলিনগণ চল্লিশ থেকে একশটির বেশি সংখ্যক বিয়ে করেছিলেন (Buchanan, 1812: Appendix, H.)। কৌলিন্যপ্রথা কিভাবে বাঙালি সমাজকে ধ্বংস করছে তা বুঝাতে ১৮১১ সালে উইলিয়াম ওয়ার্ড যে তথ্য দিয়েছেন সেখানে একজন কুলিন ১২০টি বিয়ে করেছে বলে তথ্য রয়েছে। বিদ্যাসাগর তার বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সাথে বহু বিবাহ নিয়েও কাজ করেন কেননা তিনি জানতেন বহু বিবাহ রদ করা গেলে বিধবাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এরপর বিদ্যাসাগর তাঁর লেখায় হুগলী, কলকাতা, বিক্রমপুর, বরিশাল জেলার ১১৭টি গ্রামের ৬৫২ জন বহুবিবাহকারী কুলিনের কথা উল্লেখ করেন। যাদের সম্মিলিত বিয়ের সংখ্যা ৩৫৬৮টি। যেখানে বরিশালের ৫৫ বছর বয়সী এক কুলিনের বিয়ের সংখ্যা ছিল ১০৭টি (হালদার, ১৯৭২: ২৯১-৯৫)। ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন বহু বিবাহ রদের আরেক অগ্রণী কর্মী। কুলিন ব্রাহ্মণ হিসেবে তিনি নিজে বিশটি বিয়ে করেছিলেন। তবুও তিনি বহু বিবাহের বিপক্ষে এসে 'বল্লালি সংশোধনী' নামক পুস্তক রচনা করেন। এর মধ্য দিয়ে বহু বিবাহ আন্দোলনে গতি আসে। ১৮৭৬ সালে রাসবিহারীর আন্দোলনের কথা সে সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা '*ভারত সংস্কার*' এর ১২তম সংখ্যায় স্থান পায়। তাঁর রচিত অসংখ্য কবিতা, গান, পুস্তিকার মাধ্যমে তিনি ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলে বহু বিবাহের কুফল ও সামাজিক অসঙ্গতি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। কৌলিন্য প্রথাকে ভেঙ্গে রাসবিহারী 'সর্বদ্বারী বিবাহ' প্রচলনের পক্ষে ছিলেন। নিজে কুলিন আর বহু বিবাহ করেও এ প্রথার বিরূদ্ধে তার ভূমিকা প্রশংসার

দাবি রাখে (*ঢাকা প্রকাশ*, ১৮৭৪ : ৪ সংখ্যা)। আত্মীয় সভা, বেথুন সোসাইটি থেকেও বিভিন্ন বক্তৃতায় এ প্রথার নিন্দা করা হত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্তের যুগ্ম সম্পাদনায় কিশোরীচাঁদ দত্তের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'। এ সমিতির পক্ষ থেকেই ১৮৫৫ সালে প্রথম সরকারের কাছে বহুবিবাহ রদের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়। ১৮৭৩ সালে কলকাতার 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেয়।

কৌলিন্য সমস্যার অন্য এক রূপ বাল্য বিবাহ রদের লক্ষ্যে বেশ কিছু সংগঠন ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংস্কারপন্থীরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। রামমোহর রায় কর্তৃক স্থাপিত আত্মীয় সভার ১৮১৫ সালের পর বেশ কিছু সভায় বাল্য বিবাহের কুফল নিয়ে আলোচনা হত। ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যবৃন্দও এ বিষয়ে কাজ করেছিলেন। ডিরোজিয়ানদের সংগঠন 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' এর পক্ষ থেকে বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা চালান হয়। তবে তাদের সমাজনৈতিক হেয় মনোভাবের জন্য তাদের যুক্তিবাদী চিন্তাসমূহও সাধারণ মানুষ ততটা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে চায়নি। বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালে '*সর্বশুভকরী পত্রিকা*'য় 'বাল্য বিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা সংস্কারকামী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কার্যকলাপের ভিত্তিতেই লেখা হয়েছিল। যেখানে তিনি বাল্য বিবাহ রোধের আন্দোলনকে মঙ্গলজনক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন (ঘোষ, ১৯৭৩: ২৪২)। সেসাথে স্মৃতিশাস্ত্রে বাল্য বিবাহের সমর্থনে যে সব কথা বলা আছে তা পালন করতে গিয়ে সমাজের যে অপরিমেয় ক্ষতি হচ্ছে তারও উল্লেখ করেন। বিদ্যাসাগর '*সর্বশুভকরী*' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' দেখাতে গিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার প্রথম যুক্তি ছিল, বাল্যবিবাহ শারীরিক বিষয়ের দিকে চিন্তা করলে ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। দ্বিতীয় যুক্তি ছিল, বাল্য বিবাহ বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটায়। তৃতীয়ত, বাল্য বিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের ঐক্য জন্মে না। চতুর্থত, বাল্যবিবাহের ফলে উপার্জনক্ষম হওয়ার আগে বিয়ে করার জন্য পরবর্তীতে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়। ১৮৬৪ সালে (১২৭১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) '*বাম বোধিনী*' পত্রিকাতে লেখা হয় যে অল্প বয়সে বিয়ে করে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারে না। এতে শিক্ষা প্রসার ব্যহত হয়। সেসাথে এ পত্রিকাটি রক্ষনশীলদেরও একটি যুক্তি উপস্থাপন করেন যেখানে মত প্রকাশ করা হয় যে, অধিক বয়সে বিয়ে হলে ছেলে মেয়েরা খারাপ কাজে জড়িয়ে পরতে পারে। বিদ্যাসাগর যদিও এ বিষয়ে যুক্তি দেন- তাদের অধিক পরিমানে বিদ্যা অর্জনে মনোযোগী করার বিষয়টি প্রয়োগ করতে পারলে সমস্যা থাকবে না। ১৮৭১ সালে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'বাল্য বিবাহ নিবারণী সভা'। এভাবেই উনিশ শতকের শুরু থেকে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ সম্পর্কে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে।

**বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টায় সংবাদপত্রের ভূমিকা**

উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকাগুলো সামাজিক কুপ্রথা হিসেবে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ উচ্ছেদে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। রামমোহন রায়ের *'মিরাৎ উল আখবার'* পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় পঞ্চাশ বছরের এক কুলিন মহিলার সাথে বার বছরের এক ছেলের বিয়ের খবর প্রকাশিত হয় (Malley, 1976: 10)। ১৮৩১ সালে *'সমাচার দর্পন'* এ প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, বালি গ্রামের গোবিন্দচন্দ্র নামক এক কুলিন ব্রাহ্মণ মৃত্যু বরণ করেছেন এবং সেসাথে তাঁর একশ স্ত্রী এক সাথে বিধবা হয়েছিল (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৭: ২৫৪)। কৃষ্ণমোহনের পত্রিকা *'এনকোয়েরার'* এ একটি লেখায় উল্লেখ করা হয় যে, অর্থলোভী কুলিন ব্রাহ্মণরা বিয়ে করলেই যেহেতু টাকা পেত সেহেতু তারা অর্থের লোভে চল্লিশের অধিক বিয়ে করত। অনেক সময় তাদের কোন জিনিসের প্রয়োজন হলেই একটি বিয়ে করত আর তা পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে নিয়ে নিত। সেসাথে এ প্রথাকে তারা বিভৎস হিসেবে আখ্যায়িত করে এ প্রথা দূর করার ব্যবস্থা নেয়া কর্তব্য বলে মন্তব্য দিয়েছিল (*India Gazette,* February, 1832)। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপাত্র *'জ্ঞানান্বেষণ'* পত্রিকা ১৮৩৬ সালে 'কুলীন বিবাহ' নামে এক প্রবন্ধে বিভিন্ন স্থানের ২৭ জন কুলিন ও তাদের বিবাহের কথা উল্লেখ করে। যেখানে একজন কুলিন বাষট্টিটি বিয়ে করেছেন বলে উল্লেখ আছে। সেসাথে আরও পাঁচ জনের নাম রয়েছে যারা প্রত্যেকে পঞ্চাশটি করে বিয়ে করেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৭: ২৫২-৫৩)। ১৮৩৬ সালে *'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার'* পত্রিকা বহুবিবাহ নিয়ে কাজ শুরু করে। ফেব্রুয়ারি মাসে এ পত্রিকায় 'Polygamy of the Kulin Brahmans' নামে এক লেখায় পাঁচজন কুলিনের নাম ও বিয়ের সংখ্যা উল্লেখ করে যেখানে প্রায় প্রত্যেকে ষাট থেকে একশটি করে বিয়ে করেছিল। *'সম্বাদ কৌমুদী'* এ প্রথার বিরুদ্ধে লিখে জনসচেতনতা জাগানোর প্রচেষ্টা করে। *'ইন্ডিয়া গেজেট'* পত্রিকাও এ বিষয়ে সোচ্চার ছিল। ১৮৩১ সালে এ পত্রিকায় অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে, বহুবিবাহ, কন্যা বিক্রি ও বাল্য বিবাহ রোধে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন (*The Asiatic Journal*, 1831: 114-15)। এ বছরই *'সমাচার দর্পন'*, *'সম্বাদ কৌমুদি'*তে কোন কোন কুলিন ঘরের মেয়েরা নিজেদের বিবাহ সংক্রান্ত দূরাবস্থার কথা বলে লেখা পাঠিয়ে এ প্রথা দূরীকরণে সমর্থকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। *'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার'* এর সম্পাদক এ প্রথা রদে খ্রিস্টান জনগণকে উদ্যোগী হতে বলেন। সেসাথে এ ও বলা হয় যে, হিন্দুদের পক্ষ থেকেই এ বিষয়ে সরকারের কাছে আবেদন করা উচিত আর তাতে এ পত্রিকা হতে পূর্ণ সহয়োগীতা করা হবে (*The Calcutta Christian Observer*, 1833: 133)। *'ফ্রেণ্ড অফ ইন্ডিয়া'* মত প্রকাশ করে যে, এ সব সামাজিক প্রথার কুফল সম্পর্কে দেশীয় পত্র-পত্রিকাই জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে এবং তাদের এ বিষয়ে নৈতিকতার মান উন্নত করতে পারে । পরবর্তীতে ১৮৩৬ সালে *'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার'* -এ কৌলিন্য প্রথাকে অশাস্ত্রীয়, দূর্নীতিযুক্ত আখ্যায়িত করে এবং

এর ফলে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি, গর্ভপাত, শিশুহত্যার মত ঘটনার উদ্ভব হয় বলে এ প্রথার অপসারণ চেয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করে। সেসাথে তারা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে যাতে সমাজে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে তারও ব্যবস্থা নিতে বলে (*'The Calcutta Christian Observer'*, 1836: 65)। *'রিফর্মার'* পত্রিকার সম্পাদক ও বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকেরাও সমসাময়িক সময়ে একই মত পোষণ করেন। সেসাথে দেশীয় অনেক ব্যক্তিও সমাজের এ কুপ্রথা দমনের উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদনের চেষ্টা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *'বিদ্যাদর্শন'* পত্রিকাও এ প্রথার কুফল বর্ণনা করে ও নিবারণে ১৮৪২ সালে এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করে। মিশনারীদের পত্রিকা ১৮৪০ এর দশকেও সম্পূর্ণ সময় বহু বিবাহ রদের লক্ষ্যে সোচ্চার ছিল। ১৮৫৬ সালে *'সংবাদ ভাস্কর'* বিভিন্ন অঞ্চল হতে মোট কত সংখ্যক মানুষের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র সরকারের কাছে দেয়া হয়েছিল তা প্রকাশ করে। সেসাথে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমর্থন দেখতে পেয়েও কেন এ সংক্রান্ত আইন পাশ হবেনা তা নিয়েও কথা বলে।

অন্যদিকে বাল্য বিবাহ নিয়েও অনেক পত্রিকার মাধ্যমে সংস্কারপন্থীরা সোচ্চার ছিল। বাল্য বিবাহের ফলে সমাজে যেসকল সমস্যার উদ্ভব হয় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে *'বিদ্যাদর্শন'* পত্রিকায় লেখা হয় বারাঙ্গনা সম্পর্কে। যেখানে এক বারাঙ্গনা তার নিজ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে পবিবার থেকে বিয়ে দিতে দেড়ি হওয়ার জন্যই তাকে এ পথে আসতে হয়েছে (*বিদ্যাদর্শন*, ১৮৪৬ : কার্তিক সংখ্যা)। *'বামবোধিনী পত্রিকা'*য় 'বাল্যবিবাহ' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় যে, প্রায় সব ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহের পাত্র পাত্রী নির্ধারণ করেন তাদের পিতাগণ। ফলে নিজেদের পছন্দ ভালো লাগার বিষয়টি সেখানে আসেনা এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্কও গড়ে ওঠে না (*বামবোধিনী*, ১৮৬৪ : অগ্রহায়ণ)। ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' থেকে প্রচারিত হত মাসিকপত্র *'মহাপাপ বাল্যবিবাহ'*। যেখানে সমাজে বাল্য বিবাহের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার বর্ণনা দেয়া হতো। *'সোম প্রকাশ'* পত্রিকা ১৮৭৩ সালে বহুবিবাহ রদে 'ধর্মরক্ষিণী সভা'র আবেদনকে সমালোচনা করে। সোম প্রকাশ মনে করেছিল সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক দোষ-ত্রুটি সরানোর চেষ্টা করলে এতে সকলের স্বাধীনতা লুপ্ত হবে (*সোমপ্রকাশ*, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ: ২০ আষাঢ়)। এভাবে সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে অসংখ্য পত্র পত্রিকা সামাজিক এসব ক্ষতিকারক প্রথার বিরুদ্ধে লেখা অব্যাহত রাখে। যা পরবর্তী কালে ইংরেজ সরকারকে এসকল প্রথা দূরীকরণে আইনগত ব্যাবস্থা নিয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

## বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টায় সাময়িক পত্র, প্রবন্ধ, কবিতা এবং গানের ভূমিকা

উনিশ শতকে কৌলিন্য প্রথার কুফল সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সারা ফেলে। সেসাথে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার প্রাত্যহিক সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে ক্রমান্বয়ে সচেতন হয়ে

উঠছিল। বিধবা বিবাহ সম্পর্কীত আইন হওয়ার পরও যখন সমাজে আইনের প্রয়োগ ততটা দেখা যায়নি, তখন সাধারণ মানুষ আইনের মাধ্যমে বহু বিবাহ রদ হবে সে ভরসা করতে পারেনি। বহু বিবাহ রোধে তাই মনুষত্ব্যবোধ আর প্রীতির উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিল। আর সেসব জাগরণমূলক বক্তব্য ফুটে উঠেছিল তৎকালীন কবিতা ও গানের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বহু বিবাহ' প্রবন্ধে তিনি যা আলোচনা করেছেন তা নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছিল '*বঙ্গদর্শন*' পত্রিকায়। কিভাবে তিনি সম্প্রীতির বন্ধন হিসেবে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতির সমস্যা রূপে বহু বিবাহকে চিহ্নিত করেন ও বহু বিবাহ রদে আইন হওয়া উচিত বলে মনে করেন তা উল্লেখ করা হয় (*বঙ্গদর্শন*, ১২৮০ বঙ্গাব্দ: আষাঢ়)। পূর্ব বঙ্গের কবি হরি আচার্য, তাঁর 'কবির ঝঙ্কার' কাব্যে কুলিন প্রথার সমস্যা উল্লেখ করেছেন। গম্ভীরা নামক গানে তিনি কুলিনদের কসাই নামে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলায় যে কুলনি পুত্রদের বিক্রি করা হত সেসব কথাও বলা হয়েছিল (বীরেশ্বর, ১৯৯৬: ১৪৬)। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয় নারায়ন ঘোষাল 'কলিকাতা কল্পলতায়', 'কুলিন কন্যার উক্তি' নামে গান রচনা করেন। তারা যে কুলিন প্রথার শাস্ত্রীয় উপকারিতায় বিশ্বাসী ছিলেন না তাই তাদের রচনায় ফুটে ওঠে। জয় নারায়ণ ঘোষাল কোন ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু না থাকলেও কৌলিন্য মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না (দাশগুপ্ত, ১৯৭৪: ৩৯)। হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কবিতা '*ভারত কামিনী*' তে হিন্দুদের পৈশাচিক লৌকিক সংস্কারকে আঘাত করা হয় (বসুমতি, ১৮৭১: ২৫০)। হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সম্পাদক 'কুলিন মহিলা বিলাপ' কবিতা সম্পর্কে জানান যে, বিদ্যাসাগর কুলিনদের বহু বিবাহ নিবারণ করার জন্য যে আইন লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন, এ কবিতা সেজন্যই লেখা হয়েছিল। এ কবিতায় দেখানো হয়েছে যে, ইতিহাসে কত পট পরিবর্তন হলো অথচ এ কুলিনদের দুর্ভাগা স্ত্রীদের জীবন দুঃখেই কেটে যায়। তাই রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে তাদের দুঃখ দূর করতে আইন করার জন্য এ কবিতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮৫৭ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলিন কুলসর্বস্ব' নাটকে সমাজে কুলিন কন্যার যে মর্মান্তিক অবস্থা ছিল তা তুলে ধরেছেন । তৎকালীন জনপ্রিয় লোক কবি রূপচাঁদ পক্ষী গানের মাধ্যমে বহুবিবাহ প্রথার বিরোধীতা করেন যা ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১০ আষাঢ় '*সোম প্রকাশ*' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (ঘোষ, ২০০৯: ৩২৬।)। '*এডুকেশন গেজেট*' পত্রিকায় 'কুলিন কামিনীর উক্তি' নামে একটি পদ্য প্রকাশিত হয় বলে বিহারীলাল সরকারের জীবনীকার উল্লেখ করেন। যেখানে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কুলিন মহিলারা ক্ষোভ জানিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেন। তাদের মূল বক্তব্য ছিল কুলিনদের বিরুদ্ধাচরণ যেন আর না করা হয়। যদিও লেখাটি রক্ষনশীলদের মধ্য হতে কেউ লিখে কুলিন মহিলাদের নামে প্রকাশ করেছিল। দাশরথী রায় কুলিনের সংজ্ঞা দিয়েছেন তাঁর কবিতায় যেখানে কুলিনদের ভন্ড, ঠগ হিসেবে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন (চক্রবর্তী, ১৯৪৫: ৮৩)। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী' কবিতায় কৌলিন্য প্রথার সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। এসকল কবি গীতিকারদের

রচিত গান, পদ্যে বহু বিবাহ রদের আন্দোলনে যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল তা অতুলনীয়। এর মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরি হয়ে পরবর্তীতে আইন প্রয়োগ করে এসকল প্রথা উচ্ছেদের দিকে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

বাল্যবিবাহ রোধেও বহুবিবাহের মত নানান ধরনের গীতি কবিতা রচিত হয়েছিল। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় বাঙ্গালির পৌরষহীনতার কারণ হিসেবে বাল্য বিবাহকে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর '*কর্মদেবী*' কাব্যে বাল্য বিয়ে সম্পর্কে লিখে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন '*ভারতী*' পত্রিকায় 'কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী' নামে এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। যেখানে বাল্য বিবাহের কারনে সমাজের অসঙ্গতি রূপে বারবনিতার বিষয়টি উঠে আসে (*ভারত*, ১৩০০ বঙ্গাব্দ: কার্তিক সংখ্যা)। কৌলিন্য প্রথা রক্ষা করার জন্য বাল্য বিবাহ যে কালক্রমে নারীকে নানারকম ব্যাভিচার ও যৌন অপরাধে জড়িয়ে ফেলে এ কবিতার মাধ্যমে তা ই বর্ণনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাল্য বিবাহের কুফল তার লেখায় তুলে ধরেন। বাল্য বিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রকৃত মনের মিল থাকে না তা তিনি উল্লেখ করেন 'নববঙ্গসপতির প্রেমালাপ' (মানসী কাব্যে) নামক কবিতায়। বাল্যবিয়ে ও সেসাথে কন্যাপণের ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে তৎকালীন রচিত গম্ভীরা গানে। বাল্য বিবাহ সম্পর্কে বৈষ্ণব চরন বসাক সংকলিত গ্রন্থের বিভিন্ন গানের মধ্যে তথ্য রয়েছে। রূপচাঁদ পক্ষীর গানেও বাল্যবিবাহ, বরপণ প্রথার সামাজিক নিষ্ঠুরতা নিয়ে আলাপচারিতা দেখা যায়। তিনি এ কুপ্রথার শীঘ্রই অবসান চান । এছাড়া বেশ কিছু প্রহসনে কুলিনদের বাল্যবিবাহের খারাপ দিক তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া শ্যামাচরন শ্রীমানি রচিত 'বাল্যদ্বাহ' নাটকে বাল্য বিবাহের কুফল বর্ণিত আছে। ১৮৯০ সালে বিবাহে নারীর সম্মতি বিষয়ক আন্দোলন শুরু হলে অমৃত লাল বসু 'সম্মতি সংকট' নামে নাটক রচনা করেন। যেখানে কনসেন্ট বা 'সহবাস সম্মতি' বিলের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। কনসেন্ট বিলের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেনে যে সভা হয়েছিল ও কালীঘাটে যেসব যাগযজ্ঞ হয়েছিল তার কথাও উঠে আসে। 'সমন্ধ সমাধি' নাটকেও বাল্যবিবাহের বিরূদ্ধে বলা হয়েছে ও এর বিভৎসতা দেখানো হয়েছে। মূলত এসব প্রবন্ধ, কবিতা, গান, নাটকের মধ্য দিয়ে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ সংক্রান্ত সমাজের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়। সেসাথে এসকল প্রথার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি অবতরন করে সমাজে এসব প্রথার অবস্থান নির্ধারণ করতে কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ জনগনের চেতনা উন্মেষে সাহায্য করে।

### বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদে আইনগত প্রক্রিয়া এবং সরকারি হস্তক্ষেপ

সামাজিক অকল্যাণকর প্রথা বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে এ প্রথা আইন করে উচ্ছেদের এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা উনিশ শতের ত্রিশের দশক থেকে শুরু হয়। ১৮৩০ এর দশকে '*রিফর্মার*' পত্রিকায় এসব প্রথার বিরোধীতা করে কলকাতার এক ব্রাহ্মণ আইন করে বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ প্রথা রদ করার আহ্বান করেন। পত্রিকার সম্পাদক

প্রসন্নকুমার ঠাকুরও এ প্রথা রদ করার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন । *'রিফর্মার'* পত্রিকার সম্পাদক ১৮৩৩ সালে এক সম্পাদকীয়তে কুলিন প্রথার মাধ্যমে সমাজে ব্যাভিচার বৃদ্ধি ও নৈতিকতার লোপ পায় উল্লেখ করে এ প্রথা শাস্ত্র সম্মত নয় বলে মত প্রকাশ করেন। সে লক্ষ্যে সরকারের এ প্রথা উচ্ছেদে আইন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। বহু বিবাহ রদের জন্য আইন প্রণীত হলে অনেক নারী দাসত্ব, ব্যাভিচার, অবমাননা হতে মুক্তি পাবে। সেসাথে এটিও উল্লেখ করা হয় যে, ইংল্যান্ডে যেহেতু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ সেহেতু ভারতীদেরও ব্রিটিশ সরকারের প্রজা হিসেবে সে আইনের অধীনে আসা উচিত (*The Reformer*, 1833: 7 April)। *'রিফর্মার'* পত্রিকার আইন প্রণয়নের প্রস্তাব পরবর্তীতে *'ক্যালকাটা কুরিয়ার'* পত্রিকাও সমর্থন জানায়। *'সমাচার দর্পণ'* পত্রিকাতেও ১৮৩৫ সালের ৪ জুলাই এ প্রথা শাস্ত্র সম্মত নয় এবং এ বিষয়ে আইন করা উচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়। অনেক সাধারণ মানুষও *'সমাচার দর্পণ'* এ ব্রাহ্মণ কন্যা বিক্রি ও কৌলিন্য প্রথা নিষিদ্ধ করতে গভর্ণর জেনারেলকে আহ্বান জানান (*সমাচার দর্পণ*, ১৮৩৭: ৪ জুলাই)। *'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'*র সম্পাদকের কাছে ১৮৪০ সালে ঢাকার কয়েকজন ব্যক্তি আহ্বান জানান যাতে সরকারের মাধ্যমে আইন করে এ প্রথা উচ্ছেদ করতে তিনি উদ্যোগী হন (*'The Friend of india'* , 1840: 16 April)। 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সংগঠন 'হিন্দু ফিলাডেলফিক সোসাইটি' আয়োজিত ১৮৪৩ সালের এক সেমিনারে লাডলীমোহন দত্ত নামে একজন কুলিনদের বহুবিবাহ নিয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। যেখানে তিনি এ প্রথাকে অমানবিক ও সমাজে বিভিন্ন পাপাচারের উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করে এ বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

পরবর্তীতে পঞ্চাশের দশকে বেশ কিছু সংগঠন বহুবিবাহকে সকল সামাজিক দুরবস্থার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে এ বিষয়ে সরকারের আইন করা উচিত বলে মন্তব্য করে। ১৮৫২ সালে *'সমাচার দর্পণ'*-এ বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে লেখে যে, হিন্দুদের বহুবিবাহের মত এ সকল কালো আইন বৃটিশদের কর্তৃক প্রণীত সাদা আইন ছাড়া দূর করা সম্ভব না (*সমাচার দর্পণ*, ১৮৫২: ৪১৫)। 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক সভার পক্ষ থেকে ১৮৫৫ সালের শুরুতে বহুবিবাহ আইন করে বন্ধ করার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমাজে আবেদন পাঠানো হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর কৌলিন্য প্রথা রদ করার উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে ভারতের ব্যবস্থাপক সভাকে বিবেচনা করে আইন করার একটি খসড়া প্রস্তাব দেন (*The Intelligencer*, 1855: 12 March)। এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে এ প্রথা নিবারণে আইনের উপকারিতা সম্পর্কে লিখে তৎকালীন পত্রিকা *'সমাচার সুধাবর্ষণ'*। বহুবিবাহ প্রথা উচ্ছেদে আইন করতে আরও সম্মতি দিয়েছিল *'মণিং ক্রনিকল'* পত্রিকা। তারা এ বিষয়ে আইন করলে সমাজের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা দূর হয়ে তা জনগণের জন্য কল্যাণকর হবে উল্লেখ করে (*'The Morning Chronicle'*, 1855: 1 March)।

বিদ্যাসাগর এ প্রথা রদের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য ১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। এরপর কলকাতা, ঢাকা, দিনাজপুর, বাকুড়া, যশোর, রাজশাহী, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নাটোর সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আইন করার পক্ষে অসংখ্য আবেদন আসে (Anti Polygamy, 1856: 12-14)। প্রায় দশ হাজারের বেশি লোকের স্বাক্ষর ছিল বহুবিবাহ বিরোধী আবেদনপত্রগুলিতে। এ থেকে বহুবিবাহ বিরোধী আইন পাশের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ সময় একটি খসড়া বিল তৈরি করে সরকারের কাছে পেশ করেন অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। তৎকালীন ভারতে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য জে. পি. গ্রান্ট আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি খুব জলদি এ বিষয়ে একটি বিল প্রণয়ন করতে পারবেন। *'সম্বাদ ভাস্কর'* ১৮৫৬ সালের ২৫ নভেম্বর বহু বিবাহ নিবারণে আইন পাশ হবে বলে আশা প্রকাশ করে। সেসাথে রামমোহন রায়ের পুত্র রমা প্রসাদ রায় একটি বিলের খসড়াও তৈরি করেছিলেন জে. পি. গ্রান্টের সহায়তায়।

১৮৬২ সালে কাশীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তখন তার মাধ্যমে বহু বিবাহ রদে আইন পাশ করানোর একটা প্রচেষ্টা ছিল। তবে তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যে চলে যাওয়ায় সে উদ্যোগও ব্যহত হয়েছিল। ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে দূর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ মল্লিক, গঙ্গা নারায়ণ মল্লিক সহ আরও ১৫৮০জন হিন্দু বাংলা থেকে ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন করার আবেদন জানায় (Proceedings, 1863: No. 7)। বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ বহু বিবাহ রদের উদ্দেশ্যে বড়লাট এলগিনের কাছে একটি খসড়া বিল পাঠান। ১৮৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং আরও কয়েকজন ব্যক্তি বাংলার ছোট লাটের কাছে বহুবিবাহ রদে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আবেদন পত্র দেন। বাংলার ছোট লাট লর্ড সিসিল বিডনের কাছে দেয়া আবেদন পত্রটি ছিল তার সাথে সাক্ষৎকার বিষয়ে। বিডন কয়েকদিন পর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করে তাদের আবেদনে সমর্থন জানান। ১৮৬৬ সালের ৫ এপ্রিল বিডন বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের পক্ষে মত দেন এবং এ কুপ্রথাকে অন্য কোথাও থেকে না হলেও শুধুমাত্র বাংলা থেকে হলেও দূর করার জন্য ভারত সরকারকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। তবে ভারত সরকারের পক্ষে বড়লাট লর্ড এলগিন এ বিষয়ে রাজি হয়নি। তার কাছে এ বিষয়টি বিধবা বিবাহের মত শুধুমাত্র অনুমতি দেয়া ও সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকার করার মত বিষয় ছিল না। এখানে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার বিষয় ছিল যা তখন ইংরেজ সরকারের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। আইন এর পক্ষে জনমতের প্রকাশ আরও জরুরি ভেবে এ আইন তখন পাশ করা সম্ভব হয়নি। ইংরেজ সরকার সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ মনে করতো বিধবা বিবাহ আইন পাশ করানোকে বাংলা সরকারের পক্ষ হতে এপ্রিল ১৮৬৬ সালে জানানো হয় যে, বহু বিবাহের কুপ্রভাব এত বেশি যে শুধুমাত্র বাংলার জন্য অর্থাৎ একটি প্রদেশের জন্য হলেও এ সংক্রান্ত আইন পাশ করা উচিত। ভারত সরকার ১৮৬৬ সালে ৮ আগষ্ট

বাংলার সরকারকে জানায়, এ সংক্রান্ত আবেদনে আইনের পক্ষে যেমন লোক আছে তেমনি বিপক্ষেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আছে। সেখানে নতুন একটি তদন্ত কমিটি করা হয়, যে কমিটিতে একমাত্র বিদ্যাসাগর ছাড়া কেউই আইন করে বহু বিবাহ রদ করতে মত দেননি। এরপর শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকা লেখা বন্ধ রাখেন। ১৮৭০ সালে কলকাতার 'সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভা' নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে গিয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদের বক্তব্য জানতে চায়। এ সময় ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগর রচনা করেন তার 'বহু বিবাহ রচিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'। এখানে তিনি কৌলিন্য প্রথা ও বহু বিবাহের করুন চিত্র তুলে ধরেন। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে শাস্ত্রেও একই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। আরও বলেন ধর্ম পত্নীর অনুমতি না পেলে কাম পত্নী বা উপ পত্নী রাখা যাবেনা। অনেকেই যথারীতি তাদের লেখার মাধ্যমে এ পুস্তকের বিরোধিতা করেছেন (সরকার, ১৯২২: ৩১২)। প্রথম পুস্তিকার প্রতিবাদের উত্তর দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে এ বিষয়ে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। এ পর্যায়ে তারানাথ তর্ক বাচস্পতি বিদ্যাসাগরের বিরোধীতা করে লেখেন 'বহু বিবাহবাদ' নাম দিয়ে। এছাড়া এ বিষয়ে মত প্রকাশের জন্য 'বহু বিবাহ বিষয়ক বিচার', 'বহু বিবাহ বিচার সমালোচনা', 'বহুবিবাহ সাহিত্যাসাহিত্য নির্ণয়' নামক বই রচিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা ।

বাল্যবিবাহ উৎপাটনের জন্য প্রগতিশীল হিন্দু সমাজ যে আন্দোলন শুরু করেছিল তা কালক্রমে 'কনসেন্ট বিল' ১৮৯০ এ কিছুটা পরিণতি লাভ করে। এর আগে ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট 'পাশ করিয়েছিলেন। তবে তা সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাজে এসেছিল। ১৮৯০ এর 'কনসেন্ট বিলে'র বয়স বিষয়ক আইনের খসড়ায় বারো বছর বয়সকে সহবাসের গড় বয়স হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিবাহের বয়স সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভা কিছু বলা হতে নিজেদের বিরত রাখে। তবে অনেক হিন্দু বিষয়টিকে ভেবেছিলেন বারো বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ হিসেবে এবং বিবাহকাল নির্ধারণ ও সহবাস সম্মতি আইন করা হলে জাত-পাতের আশঙ্কা থাকে বলে তারা ধরে নেয়। সেসাথে তারা ব্যাপক আন্দোলনও এর বিরুদ্ধে গড়ে তোলে। কনসেন্ট বিলের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী সভা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা দেখে *'ইংলিশ ম্যান'*, *'স্টেটসম্যান'*, *'ডেইলি নিউজ'*, *'ইন্ডিয়ান মিরর'* সহ অনেক পত্রিকার সম্পাদক বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন। *'চিত্রদর্শণ'* পত্রিকা হতে মন্তব্য করা হয় যে, সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে দেশজুড়ে যে আন্দোলন হয়েছে, আইনের জন্য কখনও এত লোক একত্রিত হয়নি (*চিত্র দর্শন*, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ: ৬৪)। তবে সকল বাদানুবাদের উর্ধ্বে গিয়ে পরবর্তীতে ১৯২৯ সালের ১৯ নভেম্বর বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন পাশ হয়।

### বাল্য ও বহু বিবাহ রদের আইন প্রণয়নে বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া

বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে ১৮৩০ এর দশকে যখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা হচ্ছিল, সেসময়ে কিছু পত্রিকার সম্পাদকগণ লিখেছিলেন যে বহু বিবাহের প্রভাব সমাজে তখন আর তেমন ছিল

না। পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর তার লেখায় বিভিন্ন অঞ্চলে কুলিনদের বয়স, বিয়ের সংখ্যা দেখিয়ে বহু বিবাহ তেমন হচ্ছেনা বলে যারা মত প্রকাশ করেন তাদের সে মতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। *'সমাচার দর্পন'*, *'ইন্ডিয়া গেজেট'* -এর মত পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দও অনেক ক্ষেত্রে আইন করে বহুবিবাহ রদ করার বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। *'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'* পত্রিকায় জনৈক লেখক এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মত ব্যক্তিরাও আইন করে এ প্রথা রদ করাকে ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি *'রিফর্মার'* পত্রিকার সম্পাদক প্রসন্নকুমার নিজে বহুবিবাহ সম্পর্কে এত লেখালেখি করা সত্ত্বেও নিজের মেয়েকে একজন কুলিনের সাথে বিয়ে দেন। সেসঙ্গে *'রিফর্মারে'*র বেশ কয়েকজন পত্র লেখকও আইন করে এ প্রথা রদকে স্বাগত জানাতে পারেনি। বহুবিবাহ রদের আন্দোলনটি চল্লিশের দশকে হ্রাস পায়। এ সময় সংস্কারবাদীরা বিধবা বিবাহ নিয়ে আলোচনা শুরু করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মূল আলোচ্য বিষয় হয় বিধবা বিবাহ। অন্যদিকে এ সময়ে বহু বিবাহ নিয়ে আন্দোলনে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মত কেউ নেতৃত্ব দেয়নি। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালিত হত। বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকা *'তত্ত্ববোধিনী'* চল্লিশের দশকে বহু বিবাহ নিয়ে কোন প্রচারণাই করেনি। ইয়ং বেঙ্গলের সদস্য লাডলীমোহন দত্ত যখন ১৮৪৩ সালে কুলীনদের বহুবিবাহ নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করে তখন প্রবন্ধে আইন করে এ প্রথা রদ করার বিষয়টিতে তৎকালীন পত্রিকা *'বেঙ্গল স্পেকটেটর'*, *'সোম প্রকাশ'* সহমত প্রকাশ করেনি। তারা কারণ হিসেবে দেখান যে, এ বিষয়ে আইন করা বৃটিশ শাসকদের কর্তব্য কর্ম না আর ভারতীয়রাও সে বিষয়ে আইন করতে বলতে পারে না। ১৮৫৫ সালে যখন 'বন্ধুবর্গ সমবায়' নামক সভা থেকে বহুবিবাহ বন্ধের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা হয় তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছিল। সমাজের প্রভাবশালী বেশ কয়েকজন ব্যক্তি এ প্রথা আইন করে রদ না করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাতে চায় এবং সে উদ্দেশ্যে তারা হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে দু'টি সভার আয়োজন করেছিলেন। পরবর্তীতে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ১,৬৩৭ জনের স্বাক্ষর সহ একটি আবেদন সরকারের কাছে দেয় হয়। যেখানে তারা উল্লেখ করে যে, বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, এটি রদ করা হলে হিন্দু ধর্ম লোপ পাবে। সুতরাং সে বিষয়ে ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি না দেয়াই ভালো। সেসাথে তাদের সমর্থনে *'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার'* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে কাশীপ্রসাদ ঘোষ উল্লেখ করেন, বহু বিবাহ প্রথা সেসময় প্রায় শেষ। সেক্ষেত্রে আইন করে এ প্রথা রদ করার প্রয়োজনীয়তাই নেই (*The Hindu Intelligencer*, 1855: July, August)। ১৮৫৫ সালে যখন বিভিন্ন স্থান থেকে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন আসে তখন বাংলার বাইরে থেকেও বহু বিবাহের পক্ষে কিছু আবেদন আসে। পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে বৃটিশ সরকারের পক্ষে বহু বিবাহ রদে আইন প্রণয়নের মত অবস্থা ছিল না। রাজনৈতিক এসব ঝামেলার মধ্যে তারা আর নতুন করে কোন ঝামেলায় যেতে চাইল না।

বাল্য বিবাহের পক্ষে '*আর্য্যদর্শন*' পত্রিকায় বঙ্গীয় বিবাহ প্রথা নামক প্রবন্ধে কনের পিতার ভূমিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের বিবেচনায় যত শীঘ্র কন্যাদান করা যায় ততই লাভ বলে বর্ণনা করা হয় (*আর্য্যদর্শন*, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ:আশ্বিন)। অনুসন্ধান পত্রিকা থেকে বাল্য বিবাহের স্বপক্ষে লেখা হয় যত কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয় অন্য গৃহে তত জলদি তাদের পোষ মানানো যায়, যা বেশি বয়স হলে সম্ভব হয় না (*অনুসন্ধান*, ১২৯৪: পৌষ)। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারপন্থীরাও পুরানো প্রথাই অনুসরণ করতেন। কেশব চন্দ্র ১৮৭১ সালে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাশ করিয়ে নিলেও তিনি তার নিজের মেয়ের বিয়েই কৌলিন্য প্রথা অনুসরণ করে দিয়েছিলেন। বাল্য বিবাহ রোধে 'কনসেন্ট বিল' ১৮৯০ পাশ হলে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা ও বিরোধিতা আসে। এ আইনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী সভায় হিন্দু মুসলিম রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিবাদ জানায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, রমেশচন্দ্র মিত্র, প্যারি মোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাল্য বিয়ের সমর্থক। বঙ্কিমচন্দ্র এক চিঠিতে সম্মতি দানের বয়স দশ থেকে বারো বছর করা হলেও এর চেয়ে যেন আর বেশি না হয় সে বিষয়ে মত দেন। এছাড়া রক্ষণশীল নেতা শশধর তর্কচূড়ামনি এ বয়স আট বছরের বেশি হওয়া উচিত না বলে মনে করেন এবং ঋতুমতি হওয়ার আগে সহবাসের সমর্থন করেন না বলে উল্লেখ করেন। 'কনসেন্ট বিল' ১৮৯০ পাশ হওয়ার পর ১৮৯১ সালে 'হায় কি সর্বনাশ ' নামে একটি পুস্তিকা বের হয়। যেখানে লর্ড ল্যান্সডাউন কে উদ্দেশ্য করে তার বিলের জন্য অনুযোগ জানানো হয়। বলা হয় ইংরেজরা এর আগে অনেকবার অনেক বিষয়ে সংস্কার করেছে, তবে সেই সংস্কারে বিশাল আকারে প্রতিবাদ করা হয়নি কেননা সেগুলোতে কোন ধর্ম নাশের ভয় ছিল না। তবে এবারের বিলে ধর্মনাশের বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

**গবেষণার প্রায়োগিক দিক**

উনিশ শতকে বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ রদের জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচিত করে এসব প্রথার বিরুদ্ধে আইন করা হয়েছিল। ১৮৭২ সালে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয়েছিল যেখানে বহুবিবাহ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীতে সাম্প্রতিক সময়ের ১৯৫০ সালে প্রণীত 'হিন্দু কোড' আইনেও এক বিয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় (বিনয় ঘোষ, ১৯৮৪: ২৭৮)। 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' ও পরবর্তীতে 'কনসেন্ট বিলে'র পর বাল্য বিবাহের ধারা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। ১৯২১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায় মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স ১২ ও ছেলেদের ১৩ বছর। পরবর্তীতে বাল্য বিবাহ রোধে ১৯২৯ সালে প্রণীত হয় 'চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেইন্ট অ্যাক্ট'। যেখানে মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে ও ছেলেদের ২১ বছরের আগে বিয়ে হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়। একই সাথে কারাদন্ড ও অর্থদন্ডে দন্ডিত করার বিধান রাখা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ২০১৭ সালে 'বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন' হয় সেখানে বিয়ের বয়স একই রেখে কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের

পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং এ আইনের আওতায় কারা আসবে তা ও সুনির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমান সমাজে এ কুপ্রথার উপস্থিতি ও তা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে এ আইনের আওতায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি করা হয়েছে। সেসাথে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য মোবাইল কোর্টেরও ব্যবস্থা করা হয়। বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ নামক সামাজিক ব্যাধিগুলো মানব উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এসব আইনের দ্বারা একধাপ এগিয়ে গেলেও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের তুলনায় এর অবস্থান এখনও অনেক নিচে। উনিশ শতকের ধারাবাহিকতায় বহুবিবাহের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ আইনে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়া ও না নিলে শাস্তির ব্যবহার রেখে বহু বিবাহকে নিরুৎসাহিত করে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য হিন্দু আইনে বহুবিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে সাম্প্রতিক কালে মত প্রকাশ করেন বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য। সেসাথে শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কারণবশত বহু বিবাহের অনুমতি রয়েছে বলে বলা হয় (*দৈনিক সংগ্রাম*, ২০১১: ১৩ ডিসেম্বর)। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়, সেসাথে পরিবর্তন ঘটে সমাজের মূল্যবোধ ও নৈতিকতার। সমাজের প্রয়োজনের সাথে মিল রেখে নতুন নতুন আইনের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি প্রয়োজন আছে আইনের সংস্কার করার। আইনের সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এটা কখনই শেষ হয়না। আইন হতে হয় সহজ এবং যা প্রয়োজনে অনায়াসে পরিবর্তন করা যায়। সর্বপরি আইন প্রবর্তন বা পরিবর্তন হতে হয় জনগণের কল্যাণে।

## উপসংহার

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় সমাজে শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে সমাজ সচেতনতা গড়ে ওঠে। সমাজের বদ্ধমূল কিছু প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন পরিচালিত হয়। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেড়ে ওঠে সচেতনতা ও পারিবারিক মূল্যবোধ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সাথে সাথে পরিবার, বিবাহ ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়নে মানুষ আগ্রহী হয়। এর সাথে যুক্ত হয় নৈতিকতাবোধ। সমাজের কুসংস্কারমূলক প্রথা দূর করতে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনও হয়েছিল। সমাজ হতে অসঙ্গতি দূরীকরণে আইনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংস্কার কার্যক্রমের একটি বিশেষ ধারা পরিচালিত হয়েছিল যুক্তি তর্কের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারকদের দ্বারা। সমাজের কুপ্রথা সমূহের মূলোৎপাটন করতে সরকারের কাছে তারা আইন প্রণয়নের আবেদন করে। সেসাথে এসব কুপ্রথার সামাজিক, অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে সচেতনতা জাগানোর চেষ্টা করে। এসকল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলনের পর বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা বা অপ্রচলিত করতে এবং বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করতে সরকার আইনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শুধুমাত্র জনসচেতনতা ও নৈতিকতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ দিনের প্রচলিত সামাজিক অসঙ্গতিসমূহ দূর করতে ব্যর্থ হয়। যে কারণে আইন করে তা সমাজের সর্বস্তরে মানতে বাধ্যবাধকতা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক

ও সংস্কারপন্থী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের মত বিষয়গুলো নিয়ে আইন করার সোচ্চার দাবি ওঠে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে গিয়ে আইনে রূপ লাভ করে। বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ রদের জন্য যেসকল আইন গৃহীত হয়েছিল তা বর্তমান যুগে আরও সম্প্রসারিত ও যুগোপোযুগী ভাবে সংস্কারের মাধ্যমে সমাজে নারী মুক্তির পথ প্রদর্শনে সহায়তা করে এবং সমাজে নারীদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

## গ্রন্থপঞ্জি


Dr. A Mukherjee, *Reform & Regeneration in Bengal (1774-1823),* Rabindra Bharati University, Calcutta, 1968.

Clauds Buchanan, *Memoir of the Expendiency of an Ecclesiastical Establishment for British India*, (2nd Ed.), London, 1812.

L. S. S. O' Malley, *Indian Caste Customs,* Cambridge University Press, London, 1976.

Anti Polygamy Tracts, No 1, Calcutta, 1856.

সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, বিবাহ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩।

দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, *বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস*, শ্রী হরি প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯১০।

নগেন্দ্রনাথ বসু, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস(ব্রাহ্মণকান্ড)*, কলকাতা, ১৯১৩।

অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা.), *'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' রামমোহন রচনাবলী*, হরপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮।

শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, প্রবাসী কার্য্যালয়, কলকাতা, ১৯৫০।

গোপাল হালদার (সম্পা.), *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার', বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খন্ড)*, দেজ পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৭২।

বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ওরিয়েন্ট লং ম্যান, কলকাতা, ১৯৭৩, ১৯৮৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৩৭।

বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে*, মণীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯৬।

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, *রঙ্গলাল রচনাবলী*, দত্ত, চৌধুরি এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৭৪।

বসুমতী, *কবিতাবলী, হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, কলকাতা, ১৮৭১।

বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০০৯।

হরিপদ চক্রবর্তী, *দাশরথীর পাচালী*, এ. মূখার্জী কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৫।

বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, শাস্ত্র প্রকাশ কার্য্যালয়, কলকাতা, ১৯২২।


## পত্রিকা


The Culin Brahmins, *The Asiatic Journal and Monthly Register,* Vol. 5, No. 18. New Series. May-August, 1831.

Legislative Department Proceedings, No. 7, December, 1863.

## সংবাদপত্র

Polygamy of the Kulin Brahmans, *The Calcutta Christian Observer*, Febeuary, 1836.
Kulin Polygamy, '*The Calcutta Review'*, Vol.XLVII, 1868.
Polygamy among the Hindoos, reprinted from the *Enquirer*, the *India Gazette*, 14.1.1832.
The Reformer on the Polygamy of the Coolin Brahmans, *The Calcutta Christian Observer*, March, 1833.
Polygamy of the Kulin Brahmans, *'The Calcutta Christian Observer'*, February, 1836.
*The Reformer*, 7.4.1833.
Civilization of the Hindoo, *'The Friend of india'* 16.04.1840.
*The Intelligencer*, 12.3.1855.
Polygamy, '*The Morning Chronicle'*, 1.3.1855.
*The Hindu Intelligencer*, 16.7.1855, 6.8.1855
*ঢাকা প্রকাশ*, ৪ সংখ্যা, ১২৮১/১৮৭৪খ্রি.।
*বিদ্যাদর্শন*, কার্তিক সংখ্যা, ১৭৬৮ শক/১৮৪৬ খ্রি. ।
*বামবোধিনী*, অগ্রহায়ণ, ১২৭১ বঙ্গাব্দ/১৮৬৪ খ্রি.।
*সোমপ্রকাশ*, ২০ আষাঢ়, ১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
*বঙ্গদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮০/ ১৮৭৩ খ্রি.।
*ভারতী*, কার্তিক সংখ্যা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।
*সমাচার দর্পণ*, ৪.৭. ১৮৩৭।
*সমাচার দর্পণ*, ২৪.৪.১৮৫২।
*চিত্র দর্শন পত্রিকা*, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।
*আর্য্যদর্শন*, আশ্বিন সংখ্যা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
*অনুসন্ধান*, ৩০ পৌষ সংখ্যা, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।
সম্পাদকীয়, *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৩.১২.২০১১।